সতীরই কেবল ধর্ষণ হয়
সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) ধারার সামাজিক বাস্তবতা

ফাতেমা শুভ্রা

জনাব আজিজুর রহমানের কন্যা বাদী হয়ে আমিনুর রহমানের পুত্র আজিজুর রহমান ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে ২০০৫ সনে গণধর্ষণের মামলা দায়ের করেন। মামলার দলিল দস্তাবেজ মোতাবেক ভিকটিম একজন অবিবাহিত কলেজ শিক্ষার্থী। ধর্ষণের অভিযুক্ত হিসেবে ৩ জন এবং ধর্ষণের সহায়তাকারী অপর ৫ জন মোট ৮ জন অভিযুক্ত অভিযোগকারিণীর বাড়ির সদস্যদের জোরপূর্বক ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে ভিকটিমকে 'গ্যাং রেপ' করে। ২০০০ সন থেকে ২০১০ সন পর্যন্ত ব্লাস্টের রেকর্ডকৃত যেসব ধর্ষণ মামলায় সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) ধারা ব্যবহার করা হয়েছিল সেসব নথিপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমি এই একটি মাত্র মামলার নথি পেলাম, যেখানে ধর্ষণের অভিযোগকারিণী 'দুশ্চরিত্রা' নন প্রমাণের মাধ্যমে মামলায় জয়ী হয়েছেন, বিচার পেয়েছেন। মামলার নথিপত্রে মাননীয় বিচারক বলেছেন, "বিজ্ঞ উকিল সাহেব মামলার শুনানিতে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন যে, ভিকটিম একজন অবিবাহিত কলেজ ছাত্রী। ভিকটিম সম্মানিত-সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা। ভিকটিমের চরিত্র নিয়ে সন্দেহের কোনো কারণই নাই। মামলার বাদী নিঃসন্দেহে একজন চরিত্রবান নারী... নিজের মর্যাদা-সম্ভ্রম ও ইজ্জতের সুস্পষ্ট প্রমাণ বাদী মামলার শুনানিতে সুস্পষ্টভাবে হাজির করতে পেরেছেন। এই চরিত্র ও ইজ্জতই একজন অবিবাহিত নারীর জন্য সবচাইতে মূল্যবান"[১]। মামলার রায়ে অভিযুক্ত ৫ জন দোষী সাব্যস্ত হন এবং বাকি ৩ জন সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে রেহাই পেয়ে যান। আমার মাথায় হঠাৎ কিছু জিজ্ঞাসা উপস্থিত হলো, সাক্ষ্য আইনের এই ধারা মোতাবেক যে নারীরা 'বিবাহিত', সম্ভ্রান্ত পরিবারের নন, সামাজিকভাবে 'সতী' নন, তাদের ক্ষেত্রে কি ধর্ষণ হয় না? ধর্ষণ যে সামাজিকভাবে "অসতী" নারীর হয় না— এটা কি আইন বলে, বলতে পারে কিংবা বলবার এখতিয়ার রাখে? কোন কোন শর্তকে আইন 'সতী' নারী বলে চিহ্নিত করে?

২.

মামলার নথিপত্র আমাকে অবিরত আমার বিগত ১০ বছরের গবেষণা অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড় করাতে থাকে। ধর্ষণের মেডিকোলিগ্যাল পরীক্ষণ পদ্ধতি 'টু-ফিঙ্গার টেস্ট' নিয়ে আমার বিগত গবেষণা কাজ স্পষ্ট করে কীভাবে দুই আঙুলের পরীক্ষার মাধ্যমে ভিকটিমের সতীত্ব পরীক্ষণ একটি নারীবিদ্বেষী বাস্তবতা হিসেবে আমাদের সমাজে বিদ্যমান ছিল। টু-ফিঙ্গার টেস্টের সামাজিক বাস্তবতা অনুসন্ধান করতে গিয়ে গবেষক হিসেবে আমি ধর্ষণ মামলায় কেন ভিকটিমের 'চরিত্র' বিষয়টি এত প্রাসঙ্গিক হয়, সে নিয়ে একটি নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজ শুরু করি। এক বছর পূর্বে এই গবেষণার উদ্দেশ্যে জেলখানায় ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত একজনের সাথে আলাপ করছিলাম। তার বিরুদ্ধে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণের মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তিনি প্রায় তিন বছর ধরে জেলখানাতেই অভিযুক্ত হিসেবে বন্দি। আলাপ চলাকালে আমি অভিযুক্তকে যতবার ধর্ষণ মামলা নিয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকি, তিনি ততবার আমাকে এক কথাই বলতে লাগলেন— 'সে ভাড়াইট্টা... ভাড়াইট্টা নষ্ট হয় কেমনে?'

ভাড়াইট্টা নারীর যে ধর্ষণ হয় না এই বিষয়গুলো আরো স্পষ্ট হতে থাকে যখন আমি ধর্ষণ মামলার নথিপত্র আরো ঘাঁটতে শুরু করি। আবদুল মাজিদ বনাম রাষ্ট্র মামলার নথি মোতাবেক এক কন্যাসন্তানের মা ভিকটিমকে

[১] Case reference : [25 BLD (AD) (2005)]

তার ছনের কুটিরে ঘুমন্ত অবস্থায় ধর্ষণ করা হয়। ভিকটিম যখন চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন, সে সময় অভিযুক্ত পালিয়ে যাচ্ছিলেন। পালানোর সময় অভিযোগকারিণীর ভাই এবং গ্রামবাসী অভিযুক্ত আসামিকে ধরে ফেলেন। পাকড়াও থাকা অবস্থায় গ্রামবাসীর কাছে অভিযুক্ত তার ধর্ষণের অপরাধ স্বীকার করেন। মামলার রায়ে বলা হয়— "যেহেতু অভিযোগকারিণী যৌনসঙ্গমে অভ্যস্ত ফলে কোনোরকম ধর্ষণের আলামত খুঁজে পাওয়া যায় নি। ভিকটিম দুশ্চরিত্রা এবং তিনি বিভিন্ন ধরনের সমাজবিরোধী ও অনৈতিক কাজের সাথে জড়িত"[২]। এই মামলার অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং অভিযুক্ত রায়ে বেকসুর প্রমাণিত হোন।

৩.

মধ্যবিত্ত শহুরে নারী হিসেবে আমার মধ্যে আদালত প্রসঙ্গে এক ধরনের সিনেমাটিক বোঝাপড়া ছিল। নাটক-সিনেমার দৃশ্যায়ণে যেরকম আদালত কক্ষ দেখানো হয় আমার মনে হতো আদালত বুঝি দেখতে এমনই। আসামি এবং ভিকটিমের আলাদা আলাদা কাঠগড়া থাকে, কেবল মামলার সাথে সংশ্লিষ্টরা ওখানে শান্তমতো বসে থাকে। নিজের গবেষণা কাজের উদ্দেশ্যে প্রথমবারের মতো আমি রাজধানীর বাইরে একটি জেলার আদালতকক্ষ পর্যবেক্ষণ করতে গেলে ভয়ংকর রকমের ধাক্কা খেয়েছিলাম। আদালতকক্ষে অসংখ্য মানুষ, তারা সকলেই একসাথে কথা বলতে থাকে, এর মধ্যেই নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে করা মামলাগুলোর শুনানি চলতে থাকে। আদালতকক্ষে ধর্ষণের অভিযোগকারিণী নারী অসংখ্য মানুষের সামনে তার ধর্ষণ অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করেন, বিবাদীপক্ষের উকিলের জেরার উত্তর দিতে গেলে ভিকটিমের আশপাশে নানারকম হাসি-তামাশা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়। আদালতকক্ষে চরিত্রসংক্রান্ত বিষয়ে বিবাদী বা অভিযুক্তপক্ষের উকিলের প্রশ্ন প্রসঙ্গে বাদীপক্ষের উকিল যখন তার আপত্তি আদালতকক্ষে উত্থাপন করতে শুরু করেন, তখন স্বয়ং বিচারক গবেষিত নারীর মামলার সময় বলে ওঠেন— 'আপনি প্রশ্ন করতে দেন না... দেখেন না কী বের হয়!

তার মানে কি থলের থেকে বেড়াল বেরোনো নারীর, যৌনসঙ্গমে অভ্যস্ত নারীর, অসামাজিক কাজে লিপ্ত নারীর, 'ভাড়াইট্টা নারীর', 'নষ্টা নারীর' ধর্ষণ হয় না? ধর্ষণের ভিকটিম কে কে হতে পারবে তার কি কোনো তালিকা আইনে আছে?

৪

চরভদ্রাসনের ১৩ বছর বয়সের মেয়েশিশু মেহেরুন্নেছাকে (ছদ্মনাম) গণধর্ষণের শিকার হয়ে অপহরণের ১ মাস পর বাড়ির কাছের পাটক্ষেত থেকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তার পিতা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(৩) ধারা মোতাবেক অপহরণ ও গণধর্ষণের মামলা দায়ের করেন। ঘটনার ৪০ দিন পর মেডিকেল সনদে চিকিৎসক কিছু তথ্য হাজির করেন যার মধ্যে আছে 'ভিকটিমের স্তন্য পুরোদস্তুর উন্নীত ও ঝুলে পড়া, যৌনকেশ বাড়ন্ত, হাইমেন পুরানো ছেঁড়া'। সনদ এই মর্মে প্রত্যয়ন করে যে, ভিকটিমের বয়স ১৬ থেকে ১৭ বছর, তার শরীরে কোনো জোরপূর্বক যৌনসঙ্গমের চিহ্ন নেই, কিন্তু ভিকটিম যৌনসঙ্গমে পূর্ব থেকে অভ্যস্ত। এই সনদের হাত ধরে পরবর্তী সময়ে অভিযুক্ত ৭ জনের মধ্যে ৫ অভিযুক্ত ব্যক্তি বেকসুর খালাস পেয়ে যান, তাদের চার্জশিটে নাম ওঠে নি। বাকি ২ অভিযুক্তের একজনের সাথে নারীটির পূর্বপরিচয় থাকবার কারণে আদালত পুনর্বার তদন্ত কর্মকর্তাকে তিনটি সূত্রে তদন্ত চালানোর নির্দেশ জারি করেন : '১. প্রত্যক্ষ, নিরপেক্ষ ও স্থানীয় লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করিতে হইবে, ২. ভিকটিমের ভালোবাসার সূত্রগুলি ভালোভাবে দেখিতে হইবে এবং ৩. তদন্তপূর্বক আসামিকে গ্রেফতার করিতে হইবে'। এই তদন্তের প্রেক্ষিতে মেডিকেল সনদের যৌনসম্পর্কে অভ্যস্ততা ও জোরপূর্বক যৌনসঙ্গমের কোনো লক্ষণ না থাকার প্রমাণ এবং ধর্ষণের অভিযুক্ত এক ব্যক্তির সাথে

[২] Case reference : [213 BLC (2008)]

অভিযোগকারীর ভালোবাসার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারার মধ্য দিয়ে কোর্ট গণধর্ষণের মামলা খারিজ করে দেয়। চার্জশিটে ওঠা ২ অভিযুক্তের একজন সাক্ষ্য আইনের মাধ্যমে ভালোবাসার সম্পর্ক এবং নারীটির সাথে তার অপর বন্ধুর শারীরিক সম্পর্ক রয়েছে এবং ধর্ষণের অভিযোগ আনয়নকারী নারীটি 'খারাপ চরিত্রের' প্রমাণের মধ্য দিয়ে অপহরণ ও ধর্ষণের মামলা থেকে খালাস পেয়ে যান।

তার মানে কি অভিযুক্তের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক থাকলে, অভিযুক্ত চেনা হলে, ধর্ষণ হয় না?

৫.

মির্জাপুর অঞ্চলের শিমুল (ছদ্মনাম) আড়তদার পরিবারের বউ হয়ে এলেন। তার প্রবাসী স্বামী বিয়ের পর ৬ মাস সংসার করে দেশ ছেড়ে গেলেন। ১০ ভাই-বোনের বিশাল সংসারে শিমুল বড়ো বউ। শিমুলের মেজ দেবর বয়সে তার চাইতে ঢের বড়ো, বিয়ে করেন নি। বাড়িতে মেজো দেবরই থাকেন। বাদবাকি সব ভাই-বোন বিবাহিত, বাড়ির বাইরে থাকেন। স্বামী জামান (ছদ্মনাম) বিদেশ যাবার পরপরই শিমুল টের পেলেন তিনি সন্তানসম্ভবা। কে বা কারা শ্বশুরবাড়িতে তার ঘরে তেল ফেলে রাখলেন। তিনি আছাড় খেয়ে পড়ে ভ্রূণ হারালেন। এরপর থেকে মেজো দেবরের কথাবার্তা তার পছন্দ হচ্ছিল না। তিনি ইনিয়ে বিনিয়ে নানাভাবে বলতে লাগলেন তার ভাই যেহেতু বিদেশে আছে, ভাবী যেন নিজেকে স্বামীহারা না ভাবে। দেবরই এখন স্বামী। শাশুড়ির ইতিবাচক সমর্থন থাকায় শ্বশুরবাড়ির কেউ মেজো দেবরের এহেন কাজকর্মে কিছু বলতেন না। জামানকে ফোনে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র বাড়ির মেয়ে শিমুল শ্বশুরবাড়ির এই অবস্থা বোঝানোর চেষ্টা করলেই স্বামী বলতেন, 'মানিয়ে নাও, কাউকে কিছু বলবার দরকার নাই'। সহ্য করতে করতে বছর না ঘুরতেই মেজো দেবরের যৌনকাজের প্রস্তাবনার ধরন আরো প্রকাশ্য হলো। ধনী মেজো দেবর ভাবী শিমুলকে নিজের ঘরে ডেকে পা টিপে দিতে বলেন। এরকম কাজ করতে না চাইলে শাশুড়ির সাথে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। শিমুলকে তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে দেয়ার ক্ষেত্রে নানা বাধা নিষেধ আসতে থাকে। বিয়ের ১৬ মাসের মাথায় মেজো দেবর নজরুল (ছদ্মনাম) হাতে অ্যাসিডসমেত যৌনকাজের প্রস্তাব দিলে ধস্তাধস্তির এক সময় বাল্বে রাখা অ্যাসিড শিমুলের গায়ে এসে পড়ে। লেপ দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে শিমুলের শরীরের বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গা ঝলসে যায়। চিৎকাররত অবস্থায় বাড়ির অপরাপর মানুষজন বিশেষভাবে শাশুড়ি, দুই ননাস এবং মেজো দেবর মিলে সেই অ্যাসিডদগ্ধ শিমুলের শরীরে মোমবাতি দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। নারী সংগঠনের এক কর্মীর মারফত ওসিসিতে আসবার পর টানা ৩ বছর মামলা চলতে থাকে। শেষমেশ ২০১০ সনে স্বামী জামানের শিমুলকে পাঠানো ডিভোর্সের পরে ধর্ষণের হুমকি এবং অ্যাসিড সন্ত্রাসের মামলায় শিমুলের বিরুদ্ধে 'স্বামী প্রবাসে থাকা অবস্থায় একাধিক দেবর ও বহিরাগতকে যৌনকাজের প্রস্তাব দিয়েছেন' এবং মেজো দেবর, অর্থাৎ নজরুল ভাবীর প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় 'অর্থের লোভে শিমুল নিজের শরীরে মোমবাতি দিয়ে আগুন লাগিয়ে মিথ্যা মামলা সাজিয়েছে। শিমুল একটা বেশ্যা।' এই মোতাবেক সাক্ষ্য দেয়ায় নারী নির্যাতন মামলা খারিজ হয়ে যায়।

তার মানে কি আমাদের এই বাস্তবতা মেনে নিতে হবে যে, কোনো নারী তার জীবদ্দশায় যদি কোনোদিন কোনোরকমের যৌনসম্পর্কে গিয়ে থাকে, তবে তিনি সারাজীবনের জন্য অন্য সব যৌনসম্পর্কে সম্মতি প্রদান করে দিলেন? এর মানে কি এই যে আপনি যদি দুর্ঘটনাবশতও বিবাহিত হয়ে যান, তারপর স্বামী কিংবা স্বামীর বাইরে আর কারো দ্বারাই আপনার ধর্ষণ সম্ভব নয়? তার মানে কি এই যে বিবাহিত নারীর ধর্ষণ হয় না? তার মানে কি এটাও যে অবিবাহিত হলেই ধর্ষণ হয়? তাহলে মেহেরুন্নেছার ধর্ষণ প্রমাণিত হলো না কেন?

৬.

২০০৫ সনের সোহেল রানা বনাম রাষ্ট্রের মামলার নথি মোতাবেক একলা ঘরে থাকা অবস্থায় ভিকটিমকে অভিযুক্ত প্রতিবেশী সোহেল রানা ধর্ষণ করেন। পরবর্তী সময়ে সোহেল রানা বিয়ের আশ্বাস দিয়ে ভিকটিমের

সাথে শারীরিক সম্পর্ক চালু রাখলে ভিকটিম গর্ভবতী হয়ে পড়েন। সন্তানের পিতা হিসেবে অভিযুক্তকে দায়ী করা হয়। মামলার রায়ে বলা হয়, "অভিযোগকারিণী অভিযুক্তের লালসার কাছে কোনোরকম প্রতিরোধ ছাড়াই আত্মসমর্পণ করেছে। অভিযোগকারিণী তার সম্ভ্রম রক্ষার জন্য কোনো চেষ্টাই করে নাই। একজন নারীর জন্য তার জীবনের চাইতে ইজ্জতই সবচাইতে মূল্যবান"[৩]। মামলার রায়ে সন্তানের পিতা হিসেবে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা গেলেও ধর্ষণের অভিযোগ থেকে তাকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়।

তবে কার ধর্ষণ হয়? তবে কি অভিযুক্তের বাচ্চা গর্ভে নিয়েও নারীর পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে তার অভিযোগ সহিহ? ধর্ষণের আইনি সংজ্ঞায়নের যে সম্মতি-অসম্মতি আছে তবে তার ভিত্তি কী? ধর্ষণ কোন নারীর হয়, তার কি কোনো সাধারণ বোঝাপড়া আছে? কোন নারী ধর্ষণের শিকার হতে পারেন, আইন কি তা আগাম নির্দিষ্ট করে দেয়ার এখতিয়ার রাখে?

৭.

১৮৭২ সনের ঔপনিবেশিক সময়ে প্রতিষ্ঠিত সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) ধারা মোতাবেক 'শ্লীলতাহানি বা বলাৎকার কিংবা ধর্ষণের অভিযোগ আনলে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে তিনি অভিযোগ আনয়নকারীর বিরুদ্ধে এই মর্মে সাক্ষ্য হাজির করতে পারেন যে নারীটি "দুশ্চরিত্রা"'। সাক্ষ্য আইনের এই ধারা আইনজীবীদের মতে তিনটি কারণে বর্তমান রয়েছে। একটি হলো, আদতে কোনো নারী ধর্ষণের অভিযোগ আনবার যোগ্যতা রাখেন কি না সেটি আইনে বিচার করবার বিষয় আছে, কেননা নারীর 'চরিত্র' ঠিকঠাক না থাকলে আসলে তিনি ধর্ষণের অভিযোগ আনবার যোগ্যতা রাখেন না। দ্বিতীয়ত, এই ধারার মধ্য দিয়ে অভিযুক্ত খুব জোরালোভাবে তার পক্ষ সমর্থন করতে পারেন যে, যেহেতু অভিযোগ আনয়নকারী নারী 'ভালো চরিত্রের' নন, অতএব তিনি ধর্ষণের অভিযোগ আনতে পারেন না। তৃতীয়ত এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো, বিচার সংস্কৃতিতে মনে করা হয়, এই ধারা ধর্ষণের মিথ্যা মামলা নিয়ন্ত্রণ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ভেবে দেখবার বিষয় হলো, নারী হিসেবে আমি বা আপনি ধর্ষণের শিকার বা সার্ভাইভার কখন হব সেটি তো আগে থেকে বলা যায় না। যেহেতু আপনার কাছের কোন নারীটি ধর্ষণের ভিকটিম হবেন সেটি আগে থেকে বলা যায় না, সেহেতু অপরাপর বেশিরভাগ অপরাধের মতো ধর্ষণও অপ্রস্তুত সময়েই আসে। ফলে যে মামলাগুলো বানোয়াট তাদের প্রস্তুতি বাণিজ্যিক কিংবা বিশেষ উদ্দেশ্যেই তৈরি করা থাকে, যেখানে বানোয়াট মামলা করে হয়রানি করাটাই মুখ্য এবং দীর্ঘ জানাশোনাসম্পন্ন লোকলস্কর ও সাক্ষী প্রমাণ হাতে নিয়েই বানোয়াট মামলাটা দায়ের করা হয়। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় অপ্রস্তুত অবস্থায় একজন নারী ধর্ষণের ভিকটিম হয়ে ওঠেন এবং মামলায় তার আনীত অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন, ওই একই প্রক্রিয়ায়ই প্রস্তুত অবস্থায় দীর্ঘ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে যথেষ্ট সাক্ষী-প্রমাণসমেত বানোয়াট বা মিথ্যা মামলাটা দায়ের করা হয়। পাঠক, তাহলে প্রশ্ন আসতেই পারে, প্রমাণ কি তবে বানানো যায়?

৮.

ধর্ষণ মামলার প্রমাণ আসলে 'সামাজিক প্রমাণ'। আইনি ভাষায় যে 'দুশ্চরিত্রা' প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়, তার কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায়ন খোদ আইনেই নেই। বলা নেই যে একজন নারী বা মানুষ কী কী করলে তাকে আইন দুশ্চরিত্রা বলবে। তাহলে এই দুশ্চরিত্রা প্রত্যয়টি বিচারালয়ে কীভাবে সবাই বুঝতে পারে? সকলে এই 'দুশ্চরিত্রা' প্রত্যয়টিকে আইনের বাইরে থাকা নারীর যৌনতা ও শরীরকেন্দ্রিক 'ভালো মন্দ'-এর যে সামাজিক ধারণা রয়েছে, তার ভিত্তিতেই বুঝতে শিখে। সামাজিক সেই ধারণায় মনে করা হয়, রাতের অন্ধকারে অচেনা মানুষ অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে তুলে নিয়ে গেলে সম্ভবত ধর্ষণ হতে পারে। নারী হিসেবে আপনি যদি ধর্ষণের পর

[৩] Case reference : [57 DLR (AD) (2005)]

মরে যেতে পারেন, নিদেনপক্ষে আত্মহত্যা করে ফেলেন, তবেই হয়ত সমাজের মনে হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে যে আপনি আদতে 'চরিত্রবান' ছিলেন; এবং চরিত্র একটা কচুপাতার পানির মতো, ঝরে পড়বার সাথে সাথেই আপনি মরেও গেলেন এবং মরে গিয়ে প্রমাণ করলেন আদতে আপনি 'সতী'। সতীত্ব শেষ হওয়াতে আপনার জীবনেরও সমাপ্তি ঘটল এবং কেবল আপনারই তাই ধর্ষণ হতে পারে।

তার মানে কি কেবল সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে চিহ্নিত 'সতী'রই ধর্ষণ হতে পারে? 'কুমারী' নারীরই কি কেবল ধর্ষণ হয়?

৯.

পুরুষতান্ত্রিক যে সমাজে আমরা বসবাস করি তার প্রতিষ্ঠানসমূহ কিন্তু কোনোভাবেই পুরুষালি মতাদর্শের বাইরে নয়। প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিক চেহারায় একটি আপাত সমব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত ঐতিহাসিকভাবে নারীপ্রশ্নে অসমতা উৎপাদন করে চলে। আমাদের সমাজে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর অধীনে ১৬ বছরের নিচে সম্মতি-অসম্মতির ঊর্ধ্বে এবং ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে অসম্মতিতে যৌনতা— এই মর্মে ধর্ষণের একটি আইনি সংজ্ঞায়ন রয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে ধর্ষণের সংজ্ঞা থাকবার পরও ভিকটিমকে এই সাক্ষ্য আইনের কারণেই ধর্ষণ মামলা দায়ের করতে গেলে 'নৈতিক চরিত্রের' পরীক্ষা দিতে হয়। নৈতিক চরিত্রের পরীক্ষা শেষে নারীটি আদৌ মামলা করবার জন্য উপযুক্ত কি না এই বোঝাপড়া বিচারালয়ে প্রমাণিত হয়। আইনিভাবে ধর্ষণ কী সেটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও ধর্ষণ মামলায় যখন ভিকটিমের অতীত 'চরিত্র', পূর্বেকার যৌনসম্পর্ক ও চর্চা বিশ্লেষণ করা হয় তখন আইনটি ভিকটিমবিদ্বেষী, সর্বোপরি নারীবিদ্বেষী একটি দ্বৈত আইনব্যবস্থা কায়েম করে। আমাদের সমাজে কোনো একজন পুরুষ কিংবা নারী আদালতে দাঁড়িয়ে বললেই আসলে 'নারীর চরিত্র মন্দ হয়ে যায়'। এই বাস্তবতায় সাক্ষ্য আইনের দ্বৈততা ধর্ষণ মামলার ক্ষেত্রে ধর্ষণ সংস্কৃতির জন্য অনুকূল, যথেষ্ট ও যথার্থ ক্যামোফ্লেজ তৈরি করতে পারে, যার মাধ্যমে অপরাধীরা ক্রমাগত পার পেয়ে যান।

পাঠক, তাহলে কি এই প্রশ্ন করা যায় না যে, ধর্ষণ মামলার ট্রায়ালে আসলে কে থাকে, অভিযুক্ত নাকি অভিযোগকারী? কেন ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির পূর্বেকার যৌনচর্চা আদালত 'চরিত্র'সংক্রান্ত একটা ক্লজের মাধ্যমে আইনিভাবেই বিশ্লেষণ করেন না?

১০.

সত্যিকারের ধর্ষিতা নারী কেমন হবে তার যেমন একটি মিথ সমাজে প্রচলিত আছে, ঠিক তেমনি ধর্ষণের ভিকটিম নারীর বিষয়ে মন্দ মিথও প্রচলিত রয়েছে। যদি কোনো ভিকটিম ধর্ষণ মামলায় 'মন্দ চরিত্রের নারী' হিসেবে চিহ্নিত হন কিংবা/এবং যদি তার সক্রিয় যৌন ইতিহাস থেকে থাকে, তবে ধর্ষণ মামলায় তার বাস্তব অর্থ বহুরকম হয়ে দাঁড়ায়; যেমন, বিচারকক্ষে এর অর্থ হতে পারে— ভিকটিম নারী যৌনকাজমাত্রই সম্মত ছিলেন, ভিকটিম নারী 'বেশ্যা' ছিলেন, তাকে বিশ্বাস করার কিছু নেই কিংবা তিনি মিথ্যা বলছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সামাজিক প্রক্রিয়ার হাত ধরে যে নারীরা নৈতিক চরিত্র স্খলনের এবং যৌন সক্রিয়তার সামাজিক লেবাস অর্জন করেন, তাদের ওপর ভয়াবহরকমের সামাজিক চাপ আসে এবং মর্যাদা নিয়ে তাদের বেঁচে থাকার পরিবেশ ধ্বসে যায়। সাক্ষ্য আইনের এই 'দুশ্চরিত্রা' প্রত্যয়টির ব্যবহার আদতে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে কাজ করে। "সীতাকে আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে সতীত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হয়"— সমাজে বহুল প্রচলিত এই মিথের মতো করে ধর্ষণ মামলার ক্ষেত্রেও সাক্ষ্য আইনের মাধ্যমে একজন ভিকটিমের আরজি তখনই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন তিনি তার নৈতিক চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারেন।

অসম লিঙ্গীয় ক্ষমতা সম্পর্কের মধ্যে বেঁচে থাকা নারীর পক্ষে পুরুষালি সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত 'নৈতিক চরিত্রবান' হয়ে ওঠা কদাচিত সম্ভবপর হয় এবং নারী ধর্ষণের অভিজ্ঞতাকে পুরুষতান্ত্রিক অভিজ্ঞতায় অবমূল্যায়িত চেহারায় দেখতে শুরু করে। তার মানে কিন্তু এই নয় যে ধর্ষণ মামলার ক্ষেত্রে অভিযুক্ত কারো অপরাধ প্রমাণিত হয় নি, কোনো আসামি ধর্ষণ মামলায় শাস্তি পান নি। ধর্ষণ মামলায় যে নারী বিচার পেয়েছেন তার ক্ষেত্রেও চরিত্রসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা মামলার ট্রায়ালে চলতে থাকে। বিবেচ্য হচ্ছে, ভিকটিমপক্ষ এবং বিচারক স্বয়ং কতটা জোরালোভাবে ভিকটিমের নৈতিক চরিত্র বিষয়ে আলোচনাকে মামলার ক্ষেত্রে খারিজ করতে পেরেছেন। এই কারণেই গবেষণায় দেখা গেছে, বিচারপ্রাপ্ত ধর্ষণ মামলায় বিচারক রায়ে বলছেন, 'ভিকটিম একজন অবিবাহিত শিক্ষিত কলেজ ছাত্রী। রুচিশীল মর্যাদাবান মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। একজন অবিবাহিত শিক্ষিত মেয়ের কাছে তার সম্মান ও ইজ্জতই সবচাইতে মূল্যবান'। অর্থাৎ কোনোরকমে যদি 'নিম্নবিত্ত', 'অশিক্ষিত', 'অরুচিশীল', 'মর্যাদাহীন', বিবাহিত কোনো নারীর ধর্ষণ হয় তবে কি তার নিকট 'সম্মান-ইজ্জত' আদরণীয় ও মূল্যবান নয়? এ কারণেই কি গৃহস্থালি কর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগ বাড়ির 'কাজের মেয়ে সহজলভ্য' এই সামাজিক বক্তব্য আইনের ভাষায় বিচারের বাণী হিসেবে প্রদানের মাধ্যমে বিচারক ধর্ষণের মামলা খারিজ করে দেন?

১১.

ধর্ষণের অভিযোগের ভিত্তি হচ্ছে নারী একটি বিশেষ যৌনক্রিয়ায় একজন বিশেষ পুরুষ বা অভিযুক্তের সাথে যৌনতায় সম্মত ছিলেন কি ছিলেন না। ফলে তিনি অতীতে ওই পুরুষ কিংবা অপরাপর অন্য পুরুষের সাথে কী করেছেন সেটি সাক্ষ্য আইনের মাধ্যমে জেনে ধর্ষণের বিরাজমান সংজ্ঞার একটি বিপরীতমুখী অবস্থান জারি রাখা হচ্ছে। ধর্ষণকে যতটা না নারীর প্রতি সহিংসতা, নারীর শরীরের প্রতি সহিংসতা, নারীর প্রতি কৃত অপরাধ হিসেবে দেখা হয়, তার চাইতে বেশি দেখা হয় নৈতিকতা, পবিত্রতা, সম্মান, সম্ভ্রম ও সতীত্বের অবকাঠামোর মধ্যে রেখে। এই বাস্তবতায়, ধর্ষণ মামলাগুলো প্রায়শই ভিকটিমের 'চরিত্রহরণ'-এর ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। অযাচিতভাবে এবং অন্যায়ভাবে বেশিরভাগ ধর্ষণ মামলায় ভিকটিমের বিগত যৌন আচরণ ও চরিত্র নিয়ে আলাপ আলোচনা হতে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ হলো, অপরাপর আর কোনো মামলার ধরনেই সাক্ষ্য এত জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে না, যতটা একজন সাক্ষী সাক্ষ্য আইনের মারফত ধর্ষণ মামলার ভিকটিমের চরিত্রসংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রভাব ফেলতে পারে। ভিকটিমের বিগত যৌন ইতিহাস নিয়ে কথোপকথন ও জিজ্ঞাসাবাদের সংস্কৃতি চালু থাকার দরুন অনেক নারী ও মেয়েশিশু ধর্ষণ মামলার অভিযোগ আনতে ভয় পান, কেউ কেউ মামলা মাঝপথে বন্ধ করে দেন অথবা কখনো কখনো প্রতিপক্ষ বা আসামিপক্ষের উকিলের জেরায় ভিকটিম নারী মানসিক-সামাজিক ও শারীরিকভাবে ট্রমাটাইজড হয়ে পড়েন; এমনকি আত্মহননের পথ বেছে নেন। মোট ফলাফলে ধর্ষণের অভিযোগ বিচারের বাইরে রয়ে যায়। ধামাচাপা পড়ে যায়।

নারীবিদ্বেষী পুরুষতান্ত্রিক প্রতিকূল প্রেক্ষাপট দমনে সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) ধারা সম্পূর্ণ বাতিলকরণ অতি জরুরি।

ফাতেমা শুভ্রা শিক্ষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। fatama.suvra@gmail.com